নাম: মো: হাসাইন মিয়া

জন্ম তারিখ: ১০ জুন, ২০১২

শহীদ হওয়ার তারিখ: ৫ আগস্ট, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা :ছাত্র,
শাহাদাতের স্থান : বানিয়াচং থানার সামনে

শহীদের জীবনী

শিশু শহীদ মো: হাসাইন মিয়ার জন্ম ২০১২ সালের ১০ জুন।হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং থানার যাত্রাপাশা গ্রামে।বাবা জনাব মো: ছানু মিয়া এবং মা জনাবা মোসা: সাজেদা আক্তার।তাঁদের ছয় সন্তানের মধ্যে হাসাইন দ্বিতীয়।

মাত্র ১২ বছর বয়সে সে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণ করে।নিজের জীবন উৎসর্গের মাধ্যমে একজন শিশু শহীদ হিসেবে ইতিহাসের পাতায় অমর হয়েছে ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী মো: হাসাইন মিয়া।

গ্রামবাংলার সহজ সরল শিশু হাসাইন

সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বাংলাদেশ।এদেশের পুণ্যভূমি সিলেট।বৃহত্তর সিলেটের হবিগঞ্জ জেলার এক মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের গ্রাম যাত্রাপাশা।এ গ্রামে জন্ম নিয়েছিলো হাসাইন নামের একটি শিশু।গ্রামের কাদা-মাটি-পানি আর আলো-বাতাস গায়ে মেখে হাটি-হাটি পা-পা করে বেড়ে উঠা তার।গ্রামের আর দশটি শিশুর মতো মেঠোপথে খালি পায়ে হাটা।পাহাড়-টিলায় চড়েবেড়ানো।চা বাগানে লুকোচুরি খেলা।কখনো একাকী বসে দিগন্তবিস্তৃত ফসলের মাঠের দিকে উদাস মনে তাকিয়ে থাকা।বাবার সাথে মসজিদে যাওয়া।সহপাঠীদের সাথে মক্তবে ও স্কুলে যাওয়া।বিকেলে মাঠে ছোট বড়ো সকলের সাথে মিলেমিশে খেলা। দলবেঁধে পুকুরে, খালে, নদীতে ঝাপ দেয়া।ডুবিয়ে ডুবিয়ে দুচোখ লাল করে ফেলা।বাড়িতে ফিরে মায়ের আদুরে বকা খাওয়া।সব বকা, সব শাসন ভুলে পরের দিন আবার একই কাজে মনোযোগী হওয়া।এইসব ছিলো তার প্রতিদিনকার জীবনের অংশ।এতকিছুর পরেও এক দিকে বাবার সাথে মাছ ধরতে যাওয়া।ক্ষেতে কাজ করা।কাঁচা সবজি বিক্রিতে সাহায্য করা।অপর দিকে বাড়িতে মাকে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করা।ছোট ভাই-বোনদের দেখাশুনা করা।সাধ্যমতো তাদের পড়ালেখায় সাহায্য করা।এসব কাজে কখনো কোনো অবহেলা ছিলো না শিশু হাসাইন মিয়ার।বরং স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনন্দচিত্তে এসব কাজ সম্পাদন করতো সদা হাস্যোজ্জ্বল এই শিশুটি।তাইতো সে মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন আর পাড়া প্রতিবেশিদের কাছে যেমন আদরের ছিলো তেমনি প্রিয়পাত্র ছিলো। সহপাঠী, বন্ধুবান্ধব আর শিক্ষকদের কাছে কচি চাঁদের মতো হাসি দিয়ে সবার হৃদয় জয় করে নিতো শহীদ হাসাইন।গ্রামবাসীরাও যেন প্রশান্তি পেতো তার নির্মল সহচর্যে।

জ্ঞানপিপাসু হাসাইন

শিশুশহীদ হাসাইন কেবলমাত্র ঘুরাফেরা, খেলাধুলা আর বন্ধুদের সাথে হৈ-হুল্লোড় করেই বেড়াতো না।পারিবারিক কাজে অংশ গ্রহণের পাশাপাশি প্রতিবেশী আর গ্রামবাসীর কাজেও সাহায্য করতো।সকলের বিপদে আপদে ছুটে যেতো হাসাইন।অথচ এতোকিছু করেও পড়াশুনা আর জ্ঞান-সাধনার আগ্রহে মোটেও ভাটা পড়েনি তার।সে মক্তবে যেমন ছিলো আরবি আর দ্বীনি শিক্ষায় পারদর্শী তেমনি স্কুলের পড়ালেখায়ও ছিলো মেধাবী, বুদ্ধিমান ও চৌকস।সহপাঠীদের সাথে সবসময় সে আপন ভাই-বোনের মতো মেশার চেষ্টা করতো।নিজের পাঠ শেখার পাশাপাশি অন্যদেরকেও যথাসাধ্য সাহায্য করতো হাসাইন।এক কথায়, ছোট বড়ো সবার সাথে অবাক করার মতো সুসম্পর্ক ছিলো তার।এর সুফলও পেয়েছিলো সে।

শহীদ হাসাইনের ছিলো বই পড়ার নেশা।পাড়ার আর স্কুলের বড়ো ভাই, ধর্মপরায়ণ চাচা-দাদা ও স্কুলের প্রিয় শিক্ষকদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বই নিয়ে পড়তো জ্ঞানপিপাসু হাসাইন।একটা পড়া শেষ করে ফিরত দিয়ে আর একটা চেয়ে নিতো।এতো অল্প বয়সেই বিভিন্ন ধর্মীয় বই, নবী-রাসূল আর সাহাবিদের জীবনী ছাড়াও বিভিন্ন ইসলামি সাহিত্য পড়তো সে।পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত কবি লেখকদের রচিত শিশুতোষ ছড়া-কবিতা, গল্প, রুপকথা, কল্পকাহিনী, ভ্রমণকাহিনী, নাটক, সাইন্স ফিকশন, কিশোর উপন্যাস আর অনুবাদ পড়তো।মাঝে মাঝে বিভিন্ন ম্যাগাজিন এবং পত্রপত্রিকা পড়তো হাসাইন।স্কুলের পাঠ শেষ করার পরে, অবসর সময়ে, খাবারের জন্য রান্না হতে দেরি হলে, স্কুল বা মক্তব বন্ধ থাকলে, কোথাও বেড়াতে গেলে, এরকম বিভিন্ন সময়ে সুযোগ পেলেই বই পড়তো শহীদ হাসাইন।একদিন খাবারের সময় হয়েছে।হাসাইন খাবার খেতে এসে দেখে, মা এখনো রান্না করছে।সে ঘর থেকে একটা বই নিয়ে রান্না ঘরে এসে মায়ের পাশে বসে পড়া শুরু করলো।চুলোয় লাকড়িটা নাড়া দিতে দিতে নিজের বইপাগল ছেলেটিকে মা জিজ্ঞেস করেন, এতো বই পড়ে কি হবে বাবা? মিষ্টি ছেলে হাসাইন মুচকি হেসে মাকে উত্তর দেয়, কি হবে তা তো জানিনা মা।ভালো লাগে তাই পড়ি।শুধু জানি যে, বই পড়ে অনেক বড়ো হওয়া যায়; অনেক বড়ো! ছোট্ট ছেলের এমন উত্তর শুনে মাও হাসেন।আর মনে মনে দোয়া করেন, আল্লাহ কবুল করুন।

শুধু তাই নয়।বই পড়ার পাশাপাশি বাবার মোবাইলে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষনীয় লেখা আর ভিডিও দেখতো হাসাইন।ফেইসবুক, ইউটিউবে কত রকমের ভিডিও! হাসাইন কোনোটা বুঝে আবার কোনোটা বুঝে না।তবে সে ভাবতে পারে; চিন্তা করতে পারে।আর এটা সে পারে বেশি বেশি বই পড়ার কারনে।একথাও বুঝতে পেরেছে স্কুলের এক শিক্ষকের কাছ থেকে ।শিক্ষক সেদিন 'আমার জীবনের লক্ষ্য' রচনা পড়াতে গিয়ে অনেকের সাথে হাসাইনকেও জিজ্ঞেস করেন, "তোমার জীবনের লক্ষ্য কি?"

হাসাইনের সাবলীল উত্তর, "বড়ো হওয়া" ।শিক্ষকের আবার প্রশ্ন, "কেমন বড়ো?" এবার হাসাইন একটু চিন্তায় পড়ে যায়।তবে বেশি সময় লাগেনি।কিছুটা আবেগের সাথে বলে উঠে, "আকাশের মতো বিশাল ; পাহাড়ের মতো উঁচু ; ফসলের মাঠের মতো বিস্তৃত আর সাগরের মতো গভীর" ।তারপর স্বভাবসুলভ মুচকি হাসি দিয়ে জিজ্ঞেস করে, "পারবো না স্যার?" শিক্ষক অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন তার দিকে।তারপর তিনিও হাসিমুখে জবাব দিলেন, "স্বপ্ন যখন দেখতে পেরেছো, নিশ্চয়ই পারবে" ।তারপর শিক্ষক হাসাইনের উদাহরণ দিয়ে অন্য শিক্ষার্থীদেরকেও বেশি বেশি বই পড়ার অভ্যাস করতে পরামর্শ

দিয়েছিলেন।

সমসাময়িক হাসাইন

দারিদ্র সীমায় অবস্থান করা একটা পরিবারের দ্বিতীয় সন্তান হাসাইন।অভাবের সংসার টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে মা-বাবা আর বড়ো ভাইয়ের সাথে তাকেও অংশগ্রহণ করতে হয়।বেশির ভাগ সময় এখানে স্বাদ আর সাধ্যের মিলন হয় না।তবুও পড়াশুনা আর পারিবারিক দায়িত্ব পালনের পরে যতটুকু সময় সুযোগ পাওয়া যায় ততটুকুই সে নিজের জন্য ভালো কাজে ব্যয় করার চেষ্টা করে।প্রাইমারি পাশ করে হাই স্কুলে উঠে হাসাইন।সে এখন ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র।নতুন বছরে তার বইয়ের সংখ্যাও যেমন বেড়েছে, স্কুলের পড়াশুনাও তেমন বেড়েছে।তারপরও সে নিয়মিত অন্যান্য বই পড়ে।দরিদ্র পিতার কমদামি পুরাতন এন্ড্রয়েড মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহার করে বিভিন্ন কিছু জানা আর শেখার চেষ্টা করে হাসাইন।স্কুলে বন্ধুর সংখ্যাও বেড়েছে তার।সেখানেও নিয়মিত গপ্পো সপ্পো করে, বড়ো ভাইয়াদের অভিজ্ঞতার কথা শুনে।বন্ধু, সহপাঠী আর বড়ো ভাইয়াদের সাথে আড্ডায় চলে ক্রিকেট, ফুটবলসহ বিভিন্ন খেলাধুলার গল্প।যাত্রাপাশা গ্রামের মানুষের গল্প।এই গল্প এক সময় জেলা শহর হয়ে চলে যায় বিভাগীয় শহর সিলেট, রাজধানী ঢাকা।তারপর সমস্ত বাংলাদেশ ঘুরে গল্প ছুটে চলে ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, ইউরোপ, আমেরিকা, চিন, রাশিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি দেশে।সারা পৃথিবী ভ্রমণ করে একসময় গল্প চলে আসে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুক, ইউটিউবে।সেখানে কতজনের কত কথা! কত রংয়ে-ঢংয়ে পেঁচানো-বাঁকানো কথাবার্তা! কত রকম হাসি ঠাট্টা করে একজন আরেকজনকে! স্কুলের পড়ালেখা নিয়েও বিভিন্ন সমালোচনা সেখানে।সমালোচনা তো থাকবেই।ইদানীং স্কুলে কি সব পড়ায় তা আসলে কেউ বুঝে না।কিসব আলু ভর্তা বানানো, বিছানা গুছানো, শরিফ থেকে শরিফা হয়ে যাওয়া আরও কতো কতো হাবিজাবি জিনিস নাকি বইয়ের মধ্যে দিয়ে রেখেছে বাস্তব শিক্ষা বিমুখী পশ্চাৎপদ সরকার।স্কুলের ক্লাস একটা হলে দুইটা হয় না এমন অবস্থা।যারা এমনিতেই ফাঁকি দিতে চায় তাদের জন্য হয়েছে মহা আনন্দ।হাই স্কুলে এসে হাসাইন খেয়াল করে ক্লাসে অধিকাংশ শিক্ষক পড়াশোনার চেয়ে বেশি বলেন কোচিংয়ের কথা; প্রাইভেটের কথা।শিক্ষকগণ ক্লাসের বেশিরভাগ সময় গান-বাজনা, অঙ্গভঙ্গি আর গল্প গুজব করেই কাটিয়ে দেন পড়ালেখার আনন্দটাই যেন হারিয়ে ফেলেছে সবাই।এক বড়ো ভাই জানালেন এইসব উল্টা-পাল্টা শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ে বিভিন্ন সাইট বা ব্লগে ইদানীং বেশ লেখা-লেখি হচ্ছে।কেউ কেউ আবার ইন্টারনেটে ছেড়ে দিচ্ছেন শিক্ষকদের সব হাস্যকর প্রশিক্ষণের ভিডিও। ফ্যাসিস্ট সরকার আবার নিজেদের অপকর্ম ঢাকার জন্য এগুলোকে মানুষের বানানো ভিডিও বলে মিথ্যাচার করছে।এরকম নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা চলে বন্ধুদের মাঝে।তারপর একসময় সকল গল্পকে সাথে নিয়ে বাড়ির পথে হাটে শহীদ হাসাইন।এভাবেই চলে যায় আরও ছয়টি বছর।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

২০২৪ সালের জুলাই মাসের শুরুর দিকে ফেইসবুকে একটা পোস্ট দেখে শহীদ হাসাইন।পুড়োটা পড়ার শেষে যা বুঝলো তার সারাংশ হচ্ছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নামে একটা সংগঠন তৈরি করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ভাইয়েরা।দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা বাতিলের পরিপত্র পুনর্বহালের দাবিতে ছাত্রসমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করে তারা।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সমাবেশে ৪ জুলাইয়ের মধ্যে দাবির বিষয়ে চূড়ান্ত সুরাহার আহবান জানানো হয়।এ সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে তিন দিনের কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।পুরো ব্যাপারটা হাসাইনের কাছে নতুন মনে হচ্ছে।তেমন কিছুই সে বুঝলো না।স্কুলে গিয়ে কোনো কোনো সহপাঠীদের মুখেও শুনে এই খবর।কারো কারো বড়ো ভাই-বোনও নাকি আছেন এই আন্দোলনের সাথে। নবম-দশম শ্রেণির কয়েকজন ভাইয়ার কাছে কিছুটা জানার চেষ্টা করে হাসাইন আর তার বন্ধুরা।বড়ো ভাইয়েরা কিছুটা বুঝিয়ে দিলেন তাদের।ভাইয়াদের কাছে জানা গেলো, বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়।পরবর্তী সময়ে বেশ কয়েকবার এ কোটা ব্যবস্থার সংস্কার করা হয়।২০১৮ সালে কোটা সংস্কারের দাবিতে চাকরি প্রত্যাশী ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের নেতৃত্বে ধারাবাহিকভাবে বিক্ষোভ এবং মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে।লাগাতার আন্দোলনের ফলে ৪ অক্টোবর ২০১৮ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা বাতিল করে পরিপত্র জারি করে সরকার।উক্ত পরিপত্রের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সাত মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ৬ ডিসেম্বর ২০২১ হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন।৫ জুন ২০২৪ বিচারপতি কে এম কামরুল কাদের ও বিচারপতি খিজির হায়াতের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ পরিপত্র বাতিল করে রায় দেন।৬ জুন ২০২৪ হাইকোর্টের দেওয়া রায় বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।এরপর ১ জুলাই ২০২৪ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের (অহঃর-ফরংপৎরসরহধঃরড়হ ঝঃঁফবহঃংং গড়াবসবহঃ) ব্যানারে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সূচনা হয়।এরপর থেকেই পরিস্থিতি বুঝে তাদের পক্ষ থেকে নিয়মিত বিভিন্ন কর্মসূচির ঘোষণা আসতে থাকে।এরই ধারাবাহিকতায় ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা আন্দোলনে গুন্ডা ছাত্রলীগ যুবলীগ আর আওয়ামীলীগসহ ক্ষমতাসীন দলের অন্য কর্মীরা শিক্ষার্থীদের ওপর নির্বিচারে হামলা চালায়।১৬ জুলাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুকে একটা অপ্রত্যাশিত ভিডিও পায় হাসাইন।ভিডিওতে সে দেখে রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরস্ত্র শিক্ষার্থী আবু সাঈদকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করছে। অকুতোভয় আবু সাঈদ দুইহাত প্রসারিত করে বুক পেতে দিয়েছে ফ্যাসিস্ট সরকারের পদলেহনকারী বজ্জাত পুলিশের কাছে।কতোটা কাপুরুষতা আর কতটা নির্লজ্জতার সাথে তারা গুলি করো আবু সাঈদের বুকে, পেটে।

হাসাইনের বুকটা যেন কেঁপে কেঁপে উঠলো ভিডিওটা দেখার পর।ঠিক কতোক্ষণ যে চুপ হয়ে ছিলো বলতে পারছে না।ভিডিওটা বন্ধুদেরকে শেয়ার করতে গিয়ে দেখলো, কিছুক্ষণ আগেই কয়েকজন বন্ধু তাকে শেয়ার করে রেখেছে এই ভিডিওটি।কেমন যেন একটা অস্থিরতা কাজ করছে তার মাঝে।ব্যাপারটা আর সে সহ্য করতে পারছে না।মোবাইলাটা রেখে উঠে যায় হাসাইন।স্কুলটাও বন্ধ করে দিয়েছে আওয়ামী সরকার।ইচ্ছে করলেই এখন বন্ধুদের সবাইকে একজায়গায় পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না।বাড়ির বাইরে গিয়ে একটু হাটাহাটি করে আসলো হাসাইন।কিছুক্ষণ পরে বাড়িতে ফিরে আসলে তার মা সদাহাস্যজ্বল ছেলের মন খারাপের কারন জিজ্ঞেস করলে হাসাইন মাকে সারাদেশে শিক্ষার্থীদের বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের কথা জানায় এবং আবু সাঈদের শহীদ হওয়ার ভিডিওটি দেখায়।ভিডিওটি দেখে মোছা: সাজেদা আক্তারেরও খুব খারাপ লাগে।তাঁর চোঁখে মুখে বিস্ময়, একটা ছেলেকে এভাবে নির্বিচারে মেরে ফেললো পুলিশ! তারপর নিজের ছেলেকে শান্তনা দেয়ার চেষ্টা করেন তিনি।হাসাইনও স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে।কিন্তু পুরোপুরি পারে না।সেদিন ঠিক মতো খেতেও পারেনি সে।পড়ায়ও মন বসাতে পারেনি।তাই একটু তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পরেছিলো।ভোরে বাবার সাথে ফজর নামাজ পড়ে ফেরার সময় কয়েকজন প্রতিবেশী চাচা-দাদা আর বড়ো ভাইদের কাছে জানতে পারে, গতকাল শুধু আবু সাঈদ একা নয়, সারা দেশে অন্তত ছয়জন শিক্ষার্থী শহীদ হয়েছে।

শুধু তাই নয় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে সরকারি বেসরকারি প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে।খুনি সরকারের প্রশাসন বিভিন্ন জায়গায় ধরপাকর শুরু করেছে।খবর শুনে শিশু হাসাইনকে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়িতে চলে আসলেন বাবা মো: ছানু মিয়া।তারপর প্রতিদিন আন্দোলনের খবর রাখে ছোট্ট হাসাইন।অনেক কথা অনেক ভাষা পুরোপুরি না বুঝলেও সেদিন থেকে হাসাইন আরো মনোযোগ দিয়ে নজর রাখতে শুরু করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আর প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে।

ঠিক একদিন পরে ১৮ জুলাই সারাদেশে শিক্ষার্থীদের সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচিরতে অতর্কিতে হামলা করে স্বৈরাচারী খুনি হাসিনা প্রশাসন।রক্তখেকো হাসিনার নির্দেশে নিষ্ঠুর গণহত্যা চালায় তারা।সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অসংখ্য ছবি ভিডিও পাওয়া যাচ্ছে।একটা ভিডিও সবচেয়ে বেশি ভাইরাল হচ্ছে।শহীদ মীর

মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ।টিয়ারশেলের গ্যাস তার চোখে লাগে।চোখ মুছতে মুছতেও সে সবাইকে পানি দিয়ে যাচ্ছে।ডেকে ডেকে বলছে, "ভাই পানি লাগবে কারো, পানি?" আর এভাবেই সাধারণ শিক্ষার্থীদের মাঝে পানি নিয়ে ছুটতে ছুটতেই মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ে মুগ্ধ।ছোট্ট হাসাইন আর নিজের চোখের পানি ধরে রাখতে পারে না।সে এসব কী দেখছে? এসব কী শুরু হয়েছে প্রিয় বাংলাদেশে! ঐদিনই সারাদেশে বিজিবি নামায় অবৈধ সরকার।ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়।দুইদিনের জন্য কারফিউ জারি করে নির্লজ্জ ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার।তারপর একটার পর একটা দিন গেছে আর ফাল্গুনের গাছের শুকনো পাতার মতো দল বেঁধে ঝরে গেছে বাংলার সোনার সন্তানেরা।প্রতিদিন গণহত্যা! বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করে রাজপথে নামে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা।আরও ভয়ংকর হয়ে উঠে খুনি সরকারের পৈচাশিকতা।কি নারী কি পুরুষ; কি যুবক কি শিশু; কোনো কিছুই বিবেচনা করে না খুনি হাসিনার গুন্ডাবাহিনীরা।যাকে যেভাবে পাচ্ছে তাকে সেভাবেই হত্যা করছে।বাংলাদেশের মানুষ আর ঘরে বসে থাকতে পারেনি।নিজের সন্তানদের রক্ষায় রাজপথে নেমে এসেছে সবাই।এবার সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলন হয়ে গেছে এদেশের আপামর জনতার আন্দোলন; গণমানুষের আন্দোলন।সবাই মিলে একযোগে ডাক দিলো নতুন এক বিপ্লবের।সব দফা সব দাবি একত্রিত হয়ে নতুন স্লোগান হয়েছে 'এক দফা এক দাবি হাসিনা তুই কবে যাবি?' এবার প্রতিটি জেলায়, থানায়, গ্রামে গ্রামে শুরু হয়েছে বিপ্লব।হাসাইনের যাত্রাপাশা গ্রামেও লেগেছে জুলাই বিপ্লবের আগুন।বড়ো ভাইয়াদের সাথে হাসাইনের সহপাঠী আর বন্ধুরাও আন্দোলনে যাবে।খবরটা শুনেই শিশু হাসাইনের মনের মধ্যে কেমন যেনো একটা উত্তেজনা কাজ করছে।যে আন্দোলনে আবু সাঈদ, মুগ্ধ ভাইয়াদের মতো শত শত মেধাবী শিক্ষার্থীরা শহীদ হয়েছে সে আন্দোলনে হাসাইন যেতে চায়।মরবে না বাঁচবে সেই চিন্তা করার এখন সময় নাই।কিন্তু মা-বাবাকে কিভাবে বলবে সেটাই চিন্তার বিষয়।পরের দিন সকালে ফজরের নামাজ পড়ে বাবার সাথে ফেরার সময় দেখা হয় পাড়ার এক বড়ো ভাইয়ের সাথে। তিনি সরকারি কলেজের একজন ছাত্র।কলেজে পড়ালেখা করলেও তিনি খুব পরহেজগার মানুষ।কথা বলার সময় কুরআন হাদিসের রেফারেন্স দেন।মানুষকে নামাজে ডাকেন।মাঝে মাঝে কয়েকজনকে নিয়ে কুরআন হাদিসের আলোচনা করেন।তিনি খুব রাজনীতি সচেতন মানুষ।তিনিই বাবাকে দেশের তাজা খবরগুলো দিলেন।তিনি জানান, ঢাকায় হেলিকপ্টার দিয়ে সাধারণ মানুষের উপর গুলি ছুঁড়ছে সরকার।একজন শিশু জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকা অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হয়েছে।স্বৈরাচার প্রশাসন কোথাও চার-পাঁচজনকে একত্রিত হতে দেখলেই গুলি করছে।রাজনৈতিক দলের নেতা, সুশীল সমাজ, মানবাধিকার কর্মী, বিভিন্ন গোষ্ঠী, সংগঠন, সমিতি, সংস্থা, আলেম-ওলামা যে-ই সরকারের এই নৃশংস তাণ্ডবের প্রতিবাদ করছে তার উপরই নেমে আসছে গ্রেপ্তার, জেল-জুলুম, গুম, হত্যা আর নানাবিধ লাঞ্ছনা।গণগ্রেপ্তারে ভরে ফেলেছে সারা দেশের কারাগার।এরকম অনেক সংবাদ শুনা হয় তার কাছে।সব শুনে বাবা ছাত্রদের জন্য অনেক আফসোস করলেন।তারপর সবাই মিলে আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে বাবার সাথে বাড়িতে চলে আসে হাসাইন।পরের দিন যাত্রাপাশা গ্রামে পুলিশ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ আর ভোট-চোর খ্যাত অত্যাচারী চেয়ারম্যান ধন মিয়ার গুন্ডাবাহিনীর ঘন ঘন আনাগোনা দেখা যায়।তারা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিপক্ষে ভাড়া করা কিছু লোক নিয়ে ছোট একটা মিছিলও বের করে।৪ আগস্ট, সরকার পতনের একদফা দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা অবৈধ সরকারের বিপক্ষে সর্বাত্মক অসহযোগ কর্মসূচির প্রথম দিনে সারা দেশে ব্যাপক সংঘাত হয়।অবৈধ স্বৈরাচার আওয়ামী সরকারের নৈরাজ্য যেন একাত্তরের পাকবাহিনীর নির্বিচারে গণহত্যাকেও হার মানায়।মানুষ যেন দিনে দুপুরে প্রত্যক্ষ করছে ২৫ মার্চের কাল রাত! পরিস্থিতি এমন দেখে বিক্ষোভকারীরা সারাদেশে নাগরিকদের 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচির আহবান জানায়।শুরুতে ৬ আগস্ট 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি জানানো হলেও পরে তা একদিন আগে ৫ আগস্ট করার ঘোষণা দেওয়া হয়।একটার পর একটা কর্মসূচির কথা শুনে রাজপথে যাওয়ার জন্য ছটফট করতে থাকে শিশু হাসাইনের মন।

আন্দোলনে যোগদান

৪ আগস্ট হাসাইন তার কয়েকজন সহপাঠী বন্ধুদের কাছে জানতে পারে পরের দিন ৫ আগস্ট এই গ্রাম থেকে অনেকেই আন্দোলনে যাবে।কেউ কেউ গোপনে আজকেই রওনা দিয়েছে।আমাদের স্কুলের অনেকেও যাবে।হাসাইন সব মনোযোগ দিয়ে শুনে আর সিদ্ধান্ত নেয় আন্দোলনে যাওয়ার।কিন্তু সে তার এই মনোবাসনা পরিবারের কারো কাছেই বলেনি।বললে যদি বাবা-মা যেতে না দেয় সেই ভয়ে।অবশেষে পরের দিন ৫ আগস্ট অন্যান্য দিনের মতো হাসাইন এবং তার বাবা ফজরের নামাজ আদায় করে জাল নিয়ে মাছ ধরতে বিলে যায়।কিছুক্ষণ পরে হাসাইনের দূর সম্পর্কের এক দাদা জনাব আলী এসে যোগ দেন তাদের সাথে।আজ ভালোই মাছ পাওয়া যাচ্ছে।মাছ ধরতে ধরতে হাসাইনের বাবা আর দাদা দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছিলেন।অনেকক্ষণ দুজনের কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে শহীদ হাসাইন।তার মনে পড়ে যায়, আজকে আন্দোলনে যাবার কথা।বাবা আর দাদার কথার এক ফাঁকে সুযোগ পেয়ে শিশু হাসাইন সাহস করে তার বাবাকে বলেই ফেলে, "বাবা আবু সাঈদ ভাইয়া ছাত্র, আমরাও তো ছাত্র।আমিও যাব মিছিলে।তুমি কিন্তু বাঁধা দিওনা।' ছোট্ট হাসাইনের এমন কথা শুনে তারা দুজনেই হাসেন।হাসাইনের বাবা কিছু মাছ নিয়ে হাসাইনকে বাড়িতে পাঠান।হাসাইন মাছ নিয়ে বাড়িতে আসে।মায়ের হাতে মাছ বুঝিয়ে দিয়ে ভালোভাবে গোসল করে সে।তারপর পরিষ্কার জামা কাপড় পড়ে কাউকে কিছু না বলে চুপচাপ বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় হাসাইন।গ্রামের রাস্তা ধরে নিজের স্কুলের দিকে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যায় হাসাইন।পথে কয়েকজন সহপাঠীর বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নেয়।কেউ কেউ তার আগেই চলে গেছে।কাউকে কাউকে বাড়ি থেকে ডেকে নেয় সে।এরপর বন্ধুরা সবাই মিলে হাঁটতে হাঁটতে দুপুর ১১ টায় পৌঁছে যায় নিজেদের স্কুলের সামনে।সেখানে লোকে লোকারণ্য! স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের সাথে যোগ দিয়েছে বিভিন্ন পেশার মানুষ।সমাজের প্রায় সকল স্তরের মানুষ এসেছে আন্দোলনে যোগ দিতে।হাসাইনের প্রিয় কয়েকজন শিক্ষকও এসেছেন।পরিচিত অনেক গ্রামবাসীকেও দেখতে পাচ্ছে হাসাইন।উপস্থিত ছাত্র জনতার সাথে সরকার পতনের এক দফা আন্দোলনে যোগ দেয় সাহসী শিশু হাসাইন আর তার বন্ধুরা।এতো দিন পরে যেন বুক ভরে শ্বাস নিত পারছে হাসাইন।আজ তার স্বপ্ন পূরণ হতে যাচ্ছে।আবু সাঈদ আর মুগ্ধ ভাইয়ার মতো শত শত শহীদের রেখে যাওয়া আন্দোলনে আজ সে আসতে পেরেছে।নিজেকে খুব গর্বিত মনে করছে হাসাইন।

শহীদ হওয়ার ঘটনা

৫ আগস্ট দুপুর ১১ টায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন তথা স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনে সরাসরি যোগাদান করে অকুতোভয় শিশু হাসাইন।সমবেত জনতার সাথে সে রওনা করে সদর রোডের দিকে।মিছিল এগিয়ে যাচ্ছে নানা বিপ্লবী স্লোগানে।আস্তে আস্তে মিছিলের সাথে মিশে যাচ্ছে রাস্তার দুপাশের বাড়িঘর আর ক্ষেত ক্ষামার থেকে ছুটে আসা জনসাধারণ।তারা যেন এমন একটা মিছিলেরই অপেক্ষায় ছিলো এতো দিন, এতো মাস, এতো বছর! ক্রমান্বয়ে মিছিলে মানুষ বাড়ছে।বাড়ছে সম্মিলিত কণ্ঠস্বরে স্লোগান।বাড়ছে মিছিলের দৈর্ঘ্য প্রস্থ।বাড়ছে প্রতিটি পদক্ষেপের গতি।বড়োদের দ্রুত গতিতে হাঁটার সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য ছোটদের রীতিমতো দৌড়াতে হচ্ছে।বেশ কিছুক্ষণ চলার পরে মিছিল গিয়ে উঠে থানা রোডে।বাম দিক থেকে আসা আরও একটা মিছিল মিলে যায় হাসাইনদের মিছিলের সাথে।দুপুর ১টায় সম্মিলিত মিছিল থানার কাছাকাছি আসলে দেখেতে পায় রাস্তায় ব্যারিকেট দিয়ে যাবার পথ রুদ্ধ করে রেখেছে বানিয়াচং থানার বর্বর পুলিশ বাহিনী।মিছিলকে আর সামনে আগাতে দিবে না তারা।কিন্তু সামনে তো যেতেই হবে।আন্দোলনকারীদের কয়েকজন কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারের সাথে কথা বলে তাদের বুঝানোর চেষ্টা করছে।ঠিক এমন সময় অত্যাচারী চেয়ারম্যান ধন মিয়া তার বিভিন্ন অস্ত্রধারী গুন্ডাবাহিনী নিয়ে অতর্কিতে হামলা করে বসে উপস্থিত জনতার উপর।এটা দেখে পুলিশও সাহস পেয়ে যায়।দিগুণ উৎসাহে তারাও সশস্ত্র আক্রমণ করে

মিছিলের উপর।হঠাৎ দুই পক্ষের এমন সশস্ত্র আক্রমনে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় আন্দোলনকারীরা।যে যেদিকে পারছে ছুটে যাচ্ছে নিরাপদ অবস্থানের খোঁজে। আশপাশের দোকানপাটের আড়ালে, অলি-গলি আর বাসাবাড়িতে ঢুকে গেছে কেউ কেউ।কিন্তু ততক্ষণে পুলিশের গুলিতে গেছে কতগুলো তাজা প্রাণ।শহীদের রক্তে আবার রঞ্জিত হলো বাংলার রাজপথ।চারিদিকে মানুষের আর্তনাদ, আহাজারি।মৃত্যুযন্ত্রণার গগনবিদারী চিৎকার।গুলি খেয়ে রাস্তার উপর পরে কাতরাচ্ছে কয়েকজন।সবার সাথে ছুটতে গিয়ে হাসাইন হঠাৎ করেই দাঁড়িয়ে যায় একটা টঙ দোকানের পাশে।কিছুক্ষণ আগেই এখানে দোকানি ছিলো।সামনের বেঞ্চে কয়েকজন লোকও বসে ছিলো।অথচ এখন কেউ নেই।কেউ ভাবতে পারেনি এখানে এভাবে নিরস্ত্র মানুষের দিকে পুলিশ গুলি করতে পারে।কিন্তু তাদের চিন্তাকে ভুল প্রমাণ করে রক্ত পিপাসু পুলিশ ঠিকই গুলি করেছে।শিশু হাসাইন চিন্তা করে সে পালাচ্ছে কেনো? মনে পরে যায় ভিডিওতে দেখা শহীদ আবু সাঈদ ভাইয়ের কথা।সে কি পালিয়েছিলো? না।তবে হাসাইন কেনো পালাবে? সে তো আবু সাঈদের মতো বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে চায় খুনিদের বন্দুকের সামনে।রাস্তা থেকে কারো বিকট চিতকারে ছেদ পরলো হাসাইনের ভাবনায়।তাকিয়ে দেখে গুলি খেয়ে রাস্তায় চিত হয়ে পড়ে আছেন দাদার বয়সী একজন।গুঙিয়ে গুঙিয়ে কারো কাছে পানি চাচ্ছেন মনে হয়।হাসাইনের মনে পড়ে গেলো শহীদ মুগ্ধ ভাইয়ের কথা।তিনি থাকলে এখন পানি খাওয়াতে পারতেন।হঠাৎ মনে হলো, মুগ্ধ ভাই নেই তো কি হয়েছে? আমি তো আছি! যেই ভাবনা সেই কাজ।সাথে সাথেই টং দোকানের পানির কলস থেকে গ্লাসে করে পানি নিয়ে যায় হাসাইন। মুরুব্বির মাথাটা আলতো করে কোলে নিয়ে পানি ভরা গ্লাসটা মুখের কাছে নিয়েছে এমন সময় পুলিশ এসে আবার দুটি গুলি করে মানুষটাকে।সাথে সাথে আকাশের দিকে শাহাদাত আঙুল ইসারা করে কি যেন বলতে বলতে শহীদ হয়ে যান প্রায় ৬৫ বছরের সাদা দাঁড়িওয়ালা লোকটা।হাসাইনের কানের পাশ দিয়ে গুলি করায় কান যেন বধির হয়ে গেল।এই সময়ে অত্যাচারী চেয়ারম্যান ধন মিয়া এসে খুনি পুলিশের এস আই সন্তোষক কুমারকে হাসাইনের উপর গুলি করে তাকে খুন করতে বলে।সময় তখন বেলা ১ টা ৩০ মিনিট।পুলিশের পোশাকে চির কলঙ্ক মাখিয়ে দিয়ে ভারতের র' এর এজেন্ট সাবেক ছাত্রলীগ গোপালীশ পুলিশ এস আই সন্তোষ কুমার মাত্র ষষ্ঠ শ্রেনীর ছাত্র ১২ বছরের নাবালক শিশু হাসাইনের মাথায় গুলি করে।খুব কাছ থেকে ফায়ার করায় গুলি হাসাইনের মাথার খুলি ভেদ করে মগজের মধ্যে প্রবেশ করে।আর সাথে সাথে অঙ্কুরেই বিনাশ হয়ে যায় আকাশের মতো বিশাল; পাহাড়ের মতো উঁচু; ফসলের মাঠের মতো বিস্তৃত আর সাগরের মতো গভীর হওয়ার স্বপ্ন দেখা একটা ছোট্ট শিশুর জীবন প্রদীপ।যে নাকি আবু সাঈদ আর মুগ্ধ হতে এসে হয়ে গেলো হবিগঞ্জ জেলার সর্বকনিষ্ঠ শহীদ।ঘাতকের একটা বুলেটের আঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় ছোট্ট শিশু মো: হাসাইন মিয়ার জীবনে অনেক বড়ো হওয়ার লক্ষ্য।

শহীদের লাশ উদ্ধার

বানিয়াচং থানার সামনে অরো অনেক শহীদের মতো গুলি খেয়ে রাস্তায় পরে ছিলো শিশুশহীদ হাসাইনের লাশ।পুলিশ অলিগলিতে, দোকানপাটের আড়ালে, মানুষের বসত বাড়িতে অবস্থান নেয়া আন্দোলনকারীদের ধরতে ব্যস্ত।আন্দোলকারীরাও বুঝতে পেরেছে লড়াই করা ছাড়া আর কোনো উপায় নাই।মরতে তো একদিন হবেই।মরার আগে জুলুমবাজ হাসিনার বেজন্মা পুলিশদের বুঝিয়ে দিতে হবে বাংলাদেশ এখনো কাশ্মীর হয়ে যায়নি।তাই এবার তারা প্রতিরোধ করা শুরু করলো।ইটের টুকরো, মাটির ঢিলা, মাটির পাতিল আর কলস ভাঙা, বাঁশ, লাঠি, ঝাড়ু মোট কথা হাতের কাছে যে যা পেল তাই দিয়ে সাধ্যমতো প্রতিরোধ গড়ে তুললো।হঠাৎ এমন গোলাগুলির শব্দ শুনে আরও গ্রামবাসী এসে যোগ দিলো আন্দোলনকারীদের সাথে।এর মধ্যে আরও বড়ো একটা মিছিল চলে এলো বানিয়াচং থানার কাছাকাছি।থানার সামনে থাকা কিছু পুলিশ"বাবা আবু সাঈদ ভাইয়াও ছাত্র, আমরাও তো ছাত্র। আমিও যাব মিছিল করতে।তুমি কিন্তু বাধা দিওনা।'

২০১২ সালের জুন মাসে পৃথিবীতে আগমন করে মাত্র ১২ বছর বয়সেই ইতিহাসের বিপ্লবী পাতায় রক্তাক্ষরে নিজের নাম লিখে গেল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন তথা চব্বিশের বিপ্লবে হবিগঞ্জের সর্বকনিষ্ঠ শহীদ মো: হাসাইন মিয়া।

ভোট ডাকাত চেয়ারম্যান ধন মিয়ার সাহায্যে শহীদদের লাশগুলো গুম করার প্ল্যান করছিলো।ধেয়ে আসা মিছিলটি ততক্ষণে থানার সামনে চলে এসেছে। গোলাগুলির শব্দ শুনে তারাও ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত ছিলো।তাই জায়গা মতো এসেই শুরু করে প্রতিরোধ।তাই লাশ গুম করা বা পুড়িয়ে ফেলার মতো সুযোগ অমানবিক পুলিশ আর পায়নি।পুলিশের ডানদিক, বামদিক আর সামনের দিক থেকে শুরু হয় ছাত্র জনতার তীব্র প্রতিরোধ।আওয়ামী পুলিশ আর খুনিরা এবার ত্রিমুখী প্রতিরোধের সামনে পড়ে।আরও আধাঘন্টা ধরে লড়াই চলে ছাত্র জনতা আর খুনিদের সাথে।এক সময় কাপুরুষ পুলিশলীগ আর আওয়ামী লীগ পিছু হটতে হটতে লেজগুটিয়ে পালিয়ে গেলো।আন্দোলনকারীরা এসে তড়িঘড়ি করে আহত, নিহতদেরকে তুলে পার্শ্ববর্তী হাসপাতালে নিয়ে গেলো।শহীদ হাসাইনের লাশ দেখে তারই এক প্রতিবেশী কোলেতুলে নেয়ার সময় দেখে বুলেটের আঘাতে তৈরি বড়ো ফুটো দিয়ে রক্তের সাথে গড়িয়ে পড়ছে মগজ।বুঝতে পারলো, যেহেতু মেধার জন্য এতো আন্দোলন সেহেতু টার্গেট করে করে মেধা বিকৃতি আর ধ্বংসের মাধ্যমেই পৈশাচিক অনন্দ পায় খুনিরা।

হাসাইনের লাশ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার জানান গুলি খাওয়ার সাথে সাথেই শাহাদাত বরণ করেছে সে।লাশ নিয়ে হাসাইনের বাড়িতে যাবার আগেই আর এক প্রতিবেশি দৌড়ে গিয়ে পৌঁছে যায় হাসাইনের বাবার নিকট।হাসাইনের বাবা তখনো পুকুরে গোসল করছিলেন।পরম আদরের ছেলের এমন মৃত্যুর সংবাদ শুনে জায়গাতেই মুষড়ে পড়েন জনাব ছানু মিয়া।তিনি চিৎকার করে কান্না করতে করতে ছুটে যান হাসপাতালের দিকে।হাসপাতালের সব ফর্মালিটি সম্পাদন করে শহীদের লাশ নিয়ে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায়।বাড়ির উঠানে নিজের কলিজার টুকরা সন্তানের লাশ দেখে শহীদ মাতা সাজেদা আক্তার পুরোপুরি ভেঙে পড়েন।দুপুরের খাবার না খেয়ে যাওয়া তার প্রিয় সন্তান রাতে ফিরে এলো খুনি পুলিশের গুলি খাওয়া লাশ হয়ে।ভাই-বোনদের কান্না আর পাড়াপড়শিদের কান্নায় ছানু মিয়ার জরাজীর্ণ বাড়িটা যেন হয়ে গেলো অনেক বড়ো একটি শোকের গ্রাম।শহীদ হাসাইনের মা কয়েকটি চিৎকার দিয়ে সাথে সাথেই অজ্ঞান হয়ে গেলেন।বাবা ছানু মিয়া বুঝেই উঠতে পারলেন যে কি হয়ে গেলো।সে এখনো নির্বাক।বাবার কাঁধে ছেলের লাশ নেয়ার যন্ত্রণা তিনি কিভাবে সহ্য করবেন? পাঁচ ওয়াক্ত নামাজি এতো ভালো একটা শিশুর এমন করুন মৃত্যুর শোক এখনো ঘুরে বেড়ায় যাত্রাপাশা গ্রাম আর গ্রামবাসীদের হৃদয়ে হৃদয়ে। কিভাবে ভুলবে তারা সেই সদালাপী, সদা হাস্যোজ্জ্বল, বুদ্ধিমান, পরোপকারী মিষ্টি ছেলে হাসাইনকে!

শহীদের জানাজা ও দাফন

৫ আগষ্ট পড়ন্ত দুপুরে বানিয়াচং থানায় হাসাইনসহ মোট ৯ জন শহীদ হন।পরের দিন ৬ আগষ্ট সকাল ১০টায় হাসাইনের নিজের স্কুল, এলার হাই স্কুল মাঠে প্রায় লক্ষাধিক মানুষের অংশগ্রহণে হাসাইনসহ মোট ৭ জন শহীদের জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।বাকি দুইজনের জানাযাও পরবর্তীতে এখানেই করা হয়। জানাযা শেষে শিশু শহীদ মো: হাসাইন মিয়াকে নিজ গ্রামের পঞ্চায়েত কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

শহীদ হাসাইন সম্পর্কে পরিচিতজনের মন্তব্য

হবিগঞ্জ জেলার সর্বকনিষ্ঠ শহীদ শিশু হাসাইন সম্পর্কে পরিচিতজনের কাছে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে হাসাইন অন্তত ভালো একজন ছেলে ছিলো।এতো ছোট বয়সেই সে বাবার সাথে মসজিদে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তো।কারো সাথে কখনো ঝগড়া বিবাদ করতো না।ছোট আর সমবয়সীদের প্রতি তার যেমন ছিলো নিখাঁদ ভালোবাসা তেমনি বড়োদের প্রতি ছিলো অগাধ শ্রদ্ধা।তার সম্পর্কে তার দূর সম্পর্কের দাদা জনাব আলীর মন্তব্য ছিলো এরক, "শহীদ হাসাইন মিয়া অত্যন্ত ভালো ছেলে ছিলো।তার বাবার সাথে সে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতো।সে মোবাইলে আবু সাঈদের শহীদ হওয়া দেখে সে আমাকে ও তার

বাবাকে বলে, বাবা আমরাওতো ছাত্র।আমিও যাব মিছিল করতে।তুমি কিন্তু বাধা দিওনা।এ কথা সকালে বলে সকাল ১১ টার দিকে আন্দোলনে চলে যায়। অন্যান্য ছাত্র বন্ধুদের সাথে বানিয়াচং থানার সামনে গেলে অত্যাচারী চেয়ারম্যান ধন মিয়া তাকে মেরে ফেলতে পুলিশকে গুলি করতে বলে।পুলিশের এস আই সন্ত্রাসী সন্তোষ কুমার নির্মমভাবে এই মাসুম বাচ্চাটার উপর গুলি চালিয়ে তাকে শহীদ করে।'

পারিবারিক পরিচিতি

শিশুশহীদ মো: হাসাইন মিয়ারা মোট ছয় ভাই-বোন।বড় ভাই মো: জাহিদ হাসান (১৪) দারুন্নাজাত মাদ্রাসায় কুরআনের হিফজ (৯ পারা) পড়ছে।হাসাইন মিয়া ছিলো মেঝো।তার পরের ভাই মো: হোসাইন (১০) বন্যতুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেনির ছাত্র।তারপরের ভাই মো: তামিম ইকবাল (৭) রায়ের পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেনিতে পড়ে।পরের ভাই মোঃ হামীম (৫) রায়ের পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী।সবার ছোট, বোন জান্নাতুল ফিরদউস (২) এখনো অবুঝ।শহীদ হাসাইনের বাবা জনাব মো: ছানু মিয়ার বয়স ৩৫ বছর।সে একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী।মা জনাবা মোসা: সাজেদা আক্তারের বয়স ২৬ বছর।তিনি একজন গৃহিণী।

আর্থিক অবস্থা

শহীদ হাসাইনদের পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই দুর্বল।তার বাবা ভ্যান গাড়িতে করে তরকারি বিক্রি করেন।কোন দিন বিক্রি হয়, কোন দিন হয় না। গ্রামে প্রায় সবাই তরি-তরকারী চাষাবাদ করে।৫ ভাইবোন আর বাবা-মাসহ শহীদ হাসাইনের ফেলে যাওয়া পরিবারে এখন ৭ জন সদস্য।তাছাড়া তার বাবার বর্তমানে আয় ইনকাম খুবই কম।বর্তমানে মাত্র ২০০০০ মাসিক আয় দিয়ে ৭ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের ভরণপোষণ ঠিক মতো করতে পারছেন না জনাব ছানু মিয়া।হাসাইন পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকে খালে-বিলে-নদীতে মাছ ধরতো।তাতে কিছু আয় হতো।এখন তাও বন্ধ।পুরাতন টিন দিয়ে ছাওয়া একটি মাত্র ছোট্ট ঘর।সে চলে যাওয়ায় তার বাবা একেবারেই ভেঙ্গে পরেছেন।আদরের মানিককে হারিয়ে তার মা-বাবা শোকে মুহ্যমান।

এক নজরে শহীদ হাসাইন

নাম : মো: হাসাইন মিয়া

পিতার নাম : মো: ছানু মিয়া

মাতার নাম : মোছা: সাজেদা আক্তার

শহীদের জন্ম : ১০ জুন ২০১২

পেশা/পদবী : ছাত্র

পেশাগত পরিচয় : ৬ষ্ঠ শ্রেনিতে অধ্যয়নরত ছিলো

বর্তমানে পারিবারিক সদস্য সংখ্যা : ০৭

স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম: যাত্রাপাশা, ওয়ার্ড নং: ০৩, ৪নং দক্ষিণ, পশ্চিম ইউনিয়ন, থানা: বানিয়াচং, জেলা: হবিগঞ্জ

ঘটানার তারিখ : ৫ আগস্ট ২০২৪

ঘটনার স্থান : বানিয়াচং থানার সামনে

আহত হওয়ার সময় : দুপুর ১টা ৩০ মিনিট

আক্রমণকারী : পুলিশের এস আই সন্তোষ কুমার

মৃত্যুর তারিখ ও স্থান : ৫ আগস্ট ২০২৪, বানিয়াচং থানার সামনে

শহীদ হওয়ার সময় : দুপুর ১টা ৩০ মিনিট

জানাজার তারিখ ও সময় : ৬ আগস ২০২৪, সকাল ১০টা

জানাজার স্থান : এলার হাই স্কুল মাঠ।

শহীদের বর্তমান কবর : পঞ্চায়েত কবরস্থান, যাত্রাপাশা, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ

প্রস্তাবনা

শহীদ হাসাইনের একজন ছাড়া প্রায় সব ভাই বোনই পড়লেখা করে।তাদের পাশে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়া খুবই দরকার।

১. বাসস্থান প্রয়োজন

২. বাবার জন্য কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দিলে উপকার হবে

৩. ভাইবোনদের লেখাপড়া চালিয়ে যাবার জন্য মাসিক ভিত্তিতে সহযোগিতা করতে পারলে ভালো হয়